১

কোচবিহারের সাধারণ পরিচয়

কোচবিহারের সাধারণ পরিচয়

বর্তমান কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতার সুন্দর আভায় নিজেকে সুসজ্জিত করেছিল তখন কোচবিহার ছিল একটি করদ মিত্র রাজ্য। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন সেই সময় কোচবিহারের মহারাজা, স্বাধীন ভারতের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘদিন আলোচনার মাধ্যমে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে আগষ্ট এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। উক্ত চুক্তির শর্তানুসারে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর কোচবিহার ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেরর তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত একটি জেলারূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

নামকরণ

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক রালফ্ ফিচ্ এই দেশের নাম 'কোচ' (Conch) লিখেছেন, 'তারিখে ফেরিস্তা' (ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কলিত) 'আকবরনামা' এবং 'তোজকে জাঁহাগিরী' পুস্তকে এই দেশের নাম 'কোচ' লেখা হয়েছে। ঐ সময় পর্তুগীজ ভ্রমণকারী স্টিফেন ক্যাসিলা এই দেশের নাম 'কোচ' (Cocho) এবং রাজধানীর নাম 'বিহার' (Biar) লিখেছেন। 'আইনে আকবরী' এবং 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে 'কোচ' দেশ এবং তার মধ্যে 'কামতা' এবং 'কামরূপ' দুইটি রাজ্যের নাম লেখা আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'বাদশাহনামা' এবং 'শাহজাহাঁনামায়' এই দেশের পশ্চিমার্দ্ধের নাম 'কামতা' স্থলে কোচবিহার এবং পূর্বার্দ্ধের নাম 'কামরূপ' স্থলে 'কোচ হাজো' লেখা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ভন্‌ভ্যান্ ব্রুক — এর আঁকা মানচিত্রে 'Ragiawerra CosBhear' নাম লেখা আছে, সপ্তদশ শতাব্দীর এক অজ্ঞাতনামা ওলন্দাজ নাবিক (নবাব মীর জুমলার সহযাত্রী) এই দেশের নাম 'কোচবিহার' লিখেছেন।

কোচবিহার নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন লোকমত শোনা যায়। কোচজাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হ'তে কোচবিহার নামের উৎপত্তি। "কোচকুমারী এবং মহাদেবের বিহারক্ষেত্র হ'তে কোচবিহার নামের উৎপত্তি। পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণ ভগবতীর 'কোচে' (ক্রোড়ে) আশ্রয়গ্রহণ করলে সেই থেকে কোচ নামের উৎপত্তি। আবার বিশ্বকোষে 'কোচ' শব্দের অর্থ 'সঙ্কোচ' লেখা আছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'সনকোষ' নদের তটবর্তী বলে 'কোক' হ'তে 'কোচ' নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই নাম বিভ্রাট দূর করবার জন্য কোচবিহার রাজসরকার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র দ্বারা 'কোচবিহার' নাম লিখিতব্য বলে প্রচার করেছেন।"[১]

অবস্থান, আয়তন, সীমা

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এক প্রান্তিক জেলা কোচবিহার। ২৫°৫৭'৫৬" উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩২'৪৬" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫২'০০"পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৮°৪৫'০২" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ৩,৩৮৬ বর্গ কিমি. ভূখণ্ড নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কোচবিহার জেলা।

কোচবিহার জেলার পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন থানা যেমন, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার এবং কুমারগ্রাম, বেষ্টন করে রয়েছে। দক্ষিণদিকে প্রধানত বাংলাদেশের রংপুর জেলার বোদা, দেবীগঞ্জ, ডোমার, ডিমলা, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, কালজানি, লালমণিরহাট, ফুলবাড়ি, নাগেশ্বরী এবং ভুরুঙ্গামারি প্রভৃতি থানা অবস্থিত। আর পূর্বে অবস্থান করছে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা।

চারদিকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড, তার মাঝে বিচ্ছিন্ন ভারত ইউনিয়নের কতগুলি গ্রাম। আবার চারিদিকে ভারত ইউনিয়নের ভূখণ্ড তার মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের মত বাংলাদেশের গ্রাম, — এদের বলা হয় 'ছিটমহল', পৃথিবীর ইতিহাসে একটা রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের এতগুলি দ্বীপের মত ভূখণ্ড কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত হ'বার সময় মোট ছিটমহলের সংখ্যা ছিল ১৩০টি এবং তাদের আয়তন ছিল ২০,৯৫৭·০৭ একর ৩২·৭৪৫ বর্গমাইল। ১৯৫২-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সরকারী বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কোচবিহারের মোট ৮৫টি ছিটমহল জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ছিটতালুকগুলি কোচবিহার জেলার অন্তর্ভূক্ত। এই জেলার মোট মহকুমা ৫টি। কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও মেখলীগঞ্জ।
এই মহকুমাগুলির আয়তন ঃ

কোচবিহার সদর	...	৭৩৭·৬	বর্গ কিমি.
তুফানগঞ্জ	...	৫৮৫·৭	" "
দিনহাটা	...	৭০৪·২	" "
মেখলীগঞ্জ	...	৪৯৭·৬	" "
মাথাভাঙ্গা	...	৬২৬·৮	" "

কোচবিহার জেলার মোট আয়তন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ঃ

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে	ছিল	১,৩০৭	বর্গমাইল
১৯২১	"	১,৩১৮	" "
১৯৫১	"	১,৩২২·৬	" "
১৯৬১	"	১,৩১৩·৯	" "

বর্তমানে এই জেলার আয়তন ৩,৩৮৬ বর্গ কিমি।

জলবায়ু

কোচবিহারের জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু। শীতকাল শুরু হয় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে এবং ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তার প্রকোপ থাকে। মে মাসে শুরু হয় গ্রীষ্মকাল, কোচবিহারে মার্চ মাসকে বসন্তকাল এবং অক্টোবর মাসকে শরৎকাল বলা চলে। সাধারণত বর্ষা শুরু হয় জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে এবং অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলতে থাকে বর্ষার প্রভাব। এই সময়কে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত ঋতু বলা চলে। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়কে মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন কাল বলা চলে। কোচবিহারে প্রধানত দুটি ঋতু, গ্রীষ্ম এবং শীত।

বৃষ্টিপাত

"কোচবিহার জেলার গ্রীষ্মকাল প্রধানত বৃষ্টিপ্রধান। গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত এই জেলায় ৩,২০১·৩ মিলিমিটার (১২৬·০০") প্রায়। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দক্ষিণ পশ্চিম থেকে শুরু করে উত্তর পূর্বদিকে ক্রমশ বেশি। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই জেলায় প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। জুন মাসই এই জেলার সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল মাস। গড়ে বৎসরে ১০২ দিন বৃষ্টিপাত হয় এই জেলায় এবং এই বৃষ্টির পরিমাণ ২৪ ঘণ্টায় ৪০০ মিলিমিটার।"[২]

নদ-নদী

মানবদেহের শিরা উপশিরার মত ছোট বড় বহু নদী এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমদুয়ার বা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই জেলায় প্রবেশ

করেছে। প্রায় সব কয়টি নদীই উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব গামিনী। আবার এই জেলাকে অতিক্রম করে তারা বাংলাদেশের রংপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। নদীর উপকূল খাড়াই এবং বালুকাপূর্ণ। নদীর একদিকে সবসময়ই চর দেখা যায়। শীতকালে এবং বৃষ্টিহীন মরশুমে নদীগুলি অগভীর ও ক্ষীণস্রোতা থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে কিংবা পাহাড়ী অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই নদীগুলি পরিপূর্ণ এবং খরস্রোতা হয়ে ওঠে। সমস্ত জেলাই নদীবাহিত নরম মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। মাটির বাঁধনও তাই দুর্বল। সেই কারণে বর্ষাকালে কোচবিহারের নদীগুলি অধিকাংশ সময়ই বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত জলপ্রবাহকে বিভিন্ন পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। তৈরি হয় নূতন নদীপথ। তখন হয়ত মূলপ্রবাহ শূন্য হয়ে পড়ে থাকে অতীতের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে। সাধারণভাবে বর্ষার সময় কোচবিহারের নদীগুলির গতিবেগ প্রতিঘণ্টায় পাঁচমাইল এবং বন্যার সময় এই গতিবেগ বেড়ে হয় ঘণ্টায় দশ মাইল। নদীগুলিতে যেমন দ্রুত জলস্ফীতি হয় তেমনি হ্রাসও হয় দ্রুত। "একসময় এই নদীপথই ছিল এই রাজ্যের প্রধান পরিবহন মাধ্যম। এই রাজ্যের তামাক একদিন অধুনা বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রেরিত হত। কোচবিহারের রাজারা সরাসরি নদীপথে কাশী পর্যন্ত যাতায়াত করতেন, তার প্রমাণ আমরা ইতিহাসে পাই।"[৩] কোচবিহারের অনেকগুলি নদীই এখন বিলুপ্ত। যে কয়টি প্রধান প্রধান নদী আছে তাদের মধ্যে ছয়টি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য। যথা ঃ- ১. তিস্তা; ২. জলঢাকা; ৩. তোরষা; ৪. কালযানী; ৫. রায়ডাক এবং ৬. গদাধর।

তিস্তা ঃ- এই জেলার অন্যতম দীর্ঘ নদী তিস্তা। সিকিম-তিব্বত সঙ্গমে চোলাপর্বতের চিরতুষারাবৃত চমলহরি শৃঙ্গ থেকে দুটি ঝরণা 'লাচেন ছু ' পশ্চিম এবং 'লাচিং-ছু' পূর্ব দিক দিয়ে পাহাড়কে বেষ্টন করে ১৪,৯০০ ফুট নিচে এসে তিব্বতের 'ছালাসু' হ্রদে এসে মিলেছে। তিব্বতী ও ভূটানি ভাষায় 'ছু' বা 'চু' কথার অর্থ ঝর্না বা ছোট নদী। এই হ্রদ থেকে তিস্তা নেমে আসার পথে 'দি-ছু' 'রংপো-ছু', তিস্তা বাজারের কাছে রঙ্গীত এবং আরো পরে রিলে, রিয়াং কালিঝোরা ও শিবক ঝোরার সাথে মিলেছে।

এই তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোচবিহার জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা দিয়ে বক্সীগঞ্জ তালুকে প্রবেশ করেছে। খাসবাস, পার মেখলীগঞ্জ, দরিপাটনী, ঝারসিংহেশ্বর, ঘরঘরিয়া এবং অন্দরণ দেবোত্তরকে দক্ষিণে রেখে ১৫ মাইল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে হলদীবাড়ী ও মেখলীগঞ্জকে দুইভাগে ভাগ করে কোচবিহারের দক্ষিণদিকে অবস্থিত কুচলীবাড়ী তালুকের মধ্য দিয়ে জেলার সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে মিশেছে। এই জেলার মধ্যে তিস্তা নদীর কোন উপনদী বা শাখানদী নাই। তবে এই জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জলপাইগুড়ি জেলার শানিয়াজান এবং খুটামারা নামে ছোট দুটি নদী মিলিত হয়ে ভোটবাড়ী তালুকে প্রবেশ করে জেলার কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করে কুচলীবাড়ীর কাছে এই জেলাকে অতিক্রম করে বাংলাদেশে গিয়ে তিস্তাতে মিলিত হয়েছে। এর সুতী নামে একটি শাখানদী আছে। এই নদীও জেলার মধ্যে নয় মাইল পথ অতিক্রম করে কুচলীবাড়ীর কাছ দিয়ে বেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

জলঢাকা ঃ- এই জেলার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি নদী জলঢাকা। এই নদী এই জেলায় বিভিন্ন অংশে মানসাই, সিঙ্গিমারি এবং ধরলা নামে পরিচিত। এই নদী ভূটান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে দি-চু (ছু) নাম নিয়ে ভূটান রাজ্যের ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করে পশ্চিমদুয়ার দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করেছে। এখানেই তার নাম হয়েছে জলঢাকা। এই তরাই অঞ্চলেই মূর্ত্তি এবং ডায়না নদী এই নদীকে স্ফীত করে তুলেছে। মেখলীগঞ্জ পরগণার শোলমারী তালুকের কাছে জলঢাকা কোচবিহারে প্রবেশ করেছে। এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় প্রথমে মিলিত হয়েছে গিলাঙী এবং পরে মিলিত হয়েছে ডুডুয়া নদী। রুইডাঙ্গার কাছে মিলিত হয়েছে মুজনাই নদী। জলঢাকা এই সঙ্গমস্থল থেকেই মুজনাই বা মানসাই নাম গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। এরপর মানাবাড়ির কাছে সুতঙ্গা এবং ধরলা নদী এসে মিলেছে। ধরলার মিলনের তিন মাইল পরেই নদী মানসাই নাম ত্যাগ করে সিঙ্গিমারি নামে পরিরিচত হয়েছে। কেননা সিঙ্গিমারি নামে একটি নদীর পুরানো প্রবাহ পথে এই নদীটি তখন প্রবাহিত হচ্ছে। গোসানীমারী মন্দিরকে উত্তরকূলে রেখে সিঙ্গিমারি দক্ষিণমুখী এগিয়ে রংপুর জেলায় প্রবেশ করেছে ডালিমগঞ্জ তালুক দক্ষিণে রেখে। পূর্বদিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে আবার এই জেলায় প্রবেশ করেছে। এখানেই সিঙ্গিমারিতে পড়েছে তোরষা; যার স্থানীয় নাম ধরলা। সংযুক্ত এই প্রবাহ তখন ধরলা নাম নিয়ে দরিবাস তালুকের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষবারের মত ভোরাম পরস্তি তালুকের দক্ষিণ-দিক দিয়ে বেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে।

তোরষা ঃ- কোচবিহার জেলার বিখ্যাত নদী তোরষা। এই নদী তিব্বতের হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূটান রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এখানে তার নাম আম-মুচু। এই আম-মুচুর সঙ্গে কংগপো এবং কয়লভ (Kylev) এসে মিলেছে। নিম্ন প্রবাহে তিনটি উপনদী চিম-কি-ফু (Chin-ki-phu) টংগকা, (Tongka) ও নাম-চু-খোলা উত্তর -পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আরও পাঁচটি উপনদী এসে মিলেছে। তারপর এই নদী জলপাইগুড়ি জেলার দীর্ঘপথ অতিক্রম করে উত্তর সীমান্তের মাথাভাঙ্গা পরগণার লাকাবাড়ি তালুক দিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-মুখী এই নদী বড়ভিটিয়ার উত্তরে কালাপানির নিম্নপ্রবাহে মানসাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সঙ্গমস্থল থেকেই তোরষা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। একটি শাখা ধরলা নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হল এঁকে বেঁকে। দিনহাটা মহকুমা শহরের দুই মাইল পশ্চিম দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ধামাইলগাছ তালুকে সিঙ্গিমারির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় শাখাটি তোরষা নাম অক্ষুণ্ণ রেখে পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কোচবিহার শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়েছে। দক্ষিণ তীরে থাকছে সুনীতিগঞ্জ এবং মহিষবাথান, আর উত্তর দিকে এসে মিলিত হয়েছে ঘরঘরিয়া। দিনহাটা মহকুমার উত্তর-পূর্ব অংশ দিয়ে বেরিয়ে তোরষা বাংলাদেশের রংপুরে প্রবেশ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে।

রায়ডাক ঃ- কোচবিহার জেলার অন্যতম প্রধান নদী রায়ডাক। তবে রায়ডাক নামে দুটি নদী আছে। দুটি রায়ডাক নদীই এই জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। একটি রায়ডাক নদী ভূটানে পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে চিন-চু নাম নিয়ে পশ্চিম দুয়ারের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই জেলার সীমান্ত থেকে তিন মাইল উত্তরে রায়ডাক নদীটি দুই শাখায় ভাগ হয়ে একটি পূর্বে ও অপরটি পশ্চিমে অগ্রসর হতে শুরু করল। এই বিভক্ত পশ্চিম মুখী শাখাই রায়ডাক নাম নিয়ে দোরকো এবং চেঙটিমারীর মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে কোচবিহার জেলায় প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় রায়ডাক নদীটিও ভূটান পর্বতের কোন এক অংশে উৎপন্ন হয়ে খাগরীবাড়ি ও রামপুরের মধ্য দিয়ে এই জেলায় প্রবেশ করে প্রায় ১০ মাইল পরে জালধোয়া তালুকের দক্ষিণে গদাধরের বা গঙ্গাধরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই রায়ডাকের নাম সাধারণভাবে পূর্ব রায়ডাক। প্রথম রায়ডাককে বলা হয় পশ্চিম রায়ডাক। পশ্চিম রায়ডাক প্রথমে মিলিত হয়েছে রঙ্‌বর সুতির সঙ্গে। মিলিত প্রবাহের নাম হয়েছে ঘোড়ামারা। ঘোড়ামারাকে সংযুক্ত করেছে রাঙাপানি নামে ছোট্ট একটি নদী। রায়ডাকের মূল উপনদী দীপা রায়ডাক, গদাধর এবং কালজানি।

গদাধর ঃ- এই নদীর অপর নাম 'সঙ্কোষ' বা 'সুবর্ণকোষা'। এর উর্দ্ধ প্রবাহের নাম গঙ্গাধর বা গদাধর। ভূটান পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে দুয়ার এলাকার সাতমাইল পথ অতিক্রম করে কোচবিহার জেলার গড়ভাঙ্গা তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দিয়ে প্রায় পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-মুখী এই নদীতে এসে মিশেছে জোড়াই এবং পরে রায়ডাক। এই নদী তারপরই পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে মরা সঙ্কোষের প্রবাহ-পথ ধরে আসামের গোয়ালপাড়া হয়ে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে পড়েছে।

কালজানি ঃ-কালজানি সঙ্কোষের উপনদী। তবে কোচবিহার জেলায় এই নদীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই নদী প্রায় কোচবিহার এবং তুফানগঞ্জকে বিভক্ত করেছে। ভূটান পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে পশ্চিমদুয়ার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই জেলার মধ্য দিয়ে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করে সঙ্কোষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এলাইকুড়ি ও ডিমা নামে দুটি নদীই প্রধানত এই কালজানিকে স্ফীতি এবং গতি দিয়েছে। এই নদীও কোচবিহার জেলাকে অতিক্রম করে রংপুরে প্রবেশ করেছে। এতদ্ব্যাতীত কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। "এদের উল্লিখিত কোন নদীর সাথে মিলিত হ'তে দেখা যায় না। এদের উৎস ও মোহনা নির্ণয় করা সহজ নয়। এই নদীগুলি হ'ল সানিয়া জান, চেনা-কাটা, ছোট মানসাই ও সন্ন্যাসী কাটা প্রভৃতি।"[৪] "কোচবিহার জেলায় নৈসর্গিক সরোবর বা হ্রদ নাই। এই রাজ্যে মাটি বালু মিশ্রিত হওয়ায় নদীর গতি সহজেই পরিবর্তিত হয়, বিলের মত জলাশয় অনেক এখানে আছে, এদের ' ছড়া ' বলে।"[৫]

চাষবাস — অধিবাসীদের আর্থসামাজিক স্বরূপ

কোচবিহার কৃষি নির্ভরশীল জেলা। অধিকাংশ লোক কৃষির উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে। "কৃষিযোগ্য আবাদি জমিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। আওয়াল ও দোয়াস প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি এবং আমন তথা হৈমন্তী (স্থানীয় ভাষায় হেমতি) ধানের উপযুক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জমি যথাক্রমে সোয়াম ও চাহারাম, আউসধান, তামাক, পাট ও রবিশস্য প্রভৃতি উৎপাদনে নিযুক্ত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা গতানুগতিক এবং অধিকাংশ জমি এক ফসলা — দুই ফসলা। জলের অভাবই এর কারণ।"[৬] "ধান তামাক পাট ও সরিষা প্রভৃতি এদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হয়

এবং আমদানী করা হয় নানা রকমের বস্ত্র, লবন, বাসন ও মশলা প্রভৃতি।"[৭] কৃষি সম্পদকে ভিত্তি করে গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে এই অঞ্চলের জনবসতি সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত নয় কারণ মাত্র শতবর্ষ পূর্বেও গ্রাম বা মৌজা বলতে প্রচলিত অর্থে যা বোঝায় তা এখানে লক্ষ্য করা যায় না। প্রধান কৃষক ও তার দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের কয়েকটি কুঁড়েঘর নিয়ে ক্ষুদ্র বসতিই গ্রাম আখ্যা পেয়েছে।

বনজ সম্পদের মধ্যে শাল ও শিশু গাছই প্রধান। সামগ্রিকভাবে এই জেলার বনজ সম্পদই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁশই প্রধান বনজ সম্পদ। গৃহ নির্মাণের উপকরণ হিসাবে এই সম্পদের চাহিদা যথেষ্ট আছে।

"প্রাণীজ সম্পদের সম্পর্কে বলা যায় ৫০ বছর আগে যা ছিল এখন তা প্রায় নির্মূল। প্রাচীনকালে এখানে বাঘ, গণ্ডার, চিতাবাঘ, বন্যমহিষ, বন্যবরাহ ভালুক এবং হরিণ প্রভৃতি পাওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে প্রায় সমস্ত বন্যপ্রাণী-ই নিশ্চিহ্ন। আবাদের প্রয়োজনে জঙ্গল নির্মূল হয়েছে, মানুষ বরাহ এবং হরিণকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।"[৮]

শিল্পকার্যে কোচবিহারবাসীগণের বিশেষ দক্ষতা দেখা যায় না। নূতন শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এ জেলায় কেবল 'এন্ডি' নামে একপ্রকার কাপড় ও মেখলি নামে চট পাওয়া যায়। এই জেলায় বাঁশ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। "বাঁশের দ্বারা সাধারণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রচুর কাজ করে থাকে যেমন, বাসগৃহ, খাট, বসার চৌকী, চেয়ার, মোড়া, পিঁড়ি, শস্য রাখার পাত্র, তেল রাখার পাত্র, দুধ রাখার পাত্র প্রভৃতি।"[৯]

"সুদূর আরাকান থেকে মগ-ব্যবসায়ীরা তামাক সংগ্রহ করতে কোচবিহারে আসত এবং এই রাজ্যে তারা কতগুলি তামাকের আরত স্থাপন করেছিল।"[১০] কোচবিহারের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সুদের কারবার ছিল অত্যন্ত লাভজনক। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পাট, তামাক, সরিষা ইত্যাদি লাভজনক বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদক হয়েও এই রাজ্যের কৃষকেরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। এদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে সুদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে কোচবিহারের তদানীন্তন কমিশনার, এইচ্ ডগলাস, কলকাতার গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলকে একটি পত্রে জানিয়েছিলনে, "So that in common, 72% (of interest on money) has considered as very moderate interest and what almost exceeds belief, that in many instances which came to immediate knowledge 360 percent has been exacted ".

প্রকৃত জনসংখ্যা গণনা কোচবিহারে আরম্ভ হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই আদমসুমারী অনুসারে রাজ্যের ১,১৯৯টি গ্রাম ও রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৫,৩২,৫৬৫ জন। পরবর্তী জনগণনা হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে । তখন ছিল ৬,০২,৬২৪ জন, তৃতীয় আদমসুমারী হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৫,৭৮,৮৬৮ জন। উক্ত জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ ছিল কলেরা রোগের মহামারী এবং অর্থনৈতিক কারণে বাস্তুত্যাগ। এই রাজ্যে প্রতিবেশী জেলাগুলি থেকে দলে দলে মানুষ এসেছে বাস করার জন্য। আবার বেশ কিছু মানুষ এই রাজ্য ত্যাগ করে জলপাইগুড়ি জেলায় বা আশে পাশের জেলাগুলিতে চলে গিয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী এই রাজ্যের বর্তমান জনসংখ্যা ২৪,৭৮,২৮০ জন, তার মধ্যে পুরুষ ১২,৭১,৭১৫ জন এবং মহিলা ১২,০৬,৫৬৫ জন। বর্তমানে এই জেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ৬৭·২১%। কোচবিহারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৭·৯০ জন কৃষক, শতকরা ১৫·৫৯ জন কৃষি শ্রমিক এবং অন্যান্য উপজীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ১৬·৪৫ জন।

উত্তর পূর্ব সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র জেলা কোচবিহার। কিন্তু এই কোচবিহার জেলা শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি প্রভৃতি কোন দিক থেকেই পিছিয়ে নেই। সকলদিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সময় থেকে। নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল উত্তরে ভূটান্ত প্রদেশ, পূর্বে ভূটান্ত প্রদেশ, গোয়ালপাড়া ও রঙ্পুর, দক্ষিণে রঙ্পুর, পশ্চিমে জলপাইগুড়ি ও রঙ্পুর। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সর্বাঙ্গীণ প্রতিভা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সূত্র ঃ

১. কোচবিহারের ইতিহাস/খাঁটোধুরী আমানত উল্লা আহমেদ পৃঃ ৬
২. Cooch Behar District Profile.
৩. কোচবিহার পরিক্রমা পৃঃ ১১
৪. কোচবিহারের ইতিহাস/ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৮
৫. কোচবিহারের ইতিহাস/যাদব চক্রবর্তী পৃঃ ৬
৬. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ পৃঃ ১৭
৭. তদেব পৃঃ ১৪
৮. তদেব পৃঃ ১৮
৯. কোচবিহারের ইতিহাস/যাদব চক্রবর্তী পৃঃ ১৩
১০. মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ পৃঃ ১৭৫